Vol. 41 | No. 2 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে

Volume	41
Issue	2
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ
Published online	February 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v41i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i2.6
Pages	152-166
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ সমালোচনা

Check for updates

আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে, আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩৭৮ ; মূল্য : ১৬৫.০০

আবুল কাসেম ফজলুল হক আমাদের দেশের অগ্রণী চিন্তাবিদদের অন্যতম। এদেশে যে কয়জন লেখক-চিন্তাবিদ জীবনাদর্শ, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, দর্শন, নীতিবিদ্যা, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে নিরন্তর আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে জাতিকে উন্নতির পথে পরিচালনা করার স্বেচ্ছাদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ। গত তিরিশ বছরে তাঁর চিন্তা-ভাবনা সংবলিত প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলো। আমাদের ধারণা, বাংলাদেশের অগ্রসর চেতনার পাঠকেরা সেগুলোর সঙ্গে পরিচিত। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত তাঁর 'আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে' গ্রন্থটি সেই ধারায়ই এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

এগ্রন্থে মোট ২০টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধই আকারে বড়, বিষয়ে বিস্তৃতগামী, চিন্তায় সমৃদ্ধ এবং গুরুত্বে ও উপযোগিতায় ব্যতিক্রমী। এ গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার আগে প্রায় সব প্রবন্ধই দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনোটি একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। সংকলিত এই বিশটি প্রবন্ধের মধ্যে অন্তত তিন চারটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। ভূমিকায় লেখক কোন্ প্রবন্ধ কোন্ পটভূমিতে রচিত ও কোথায় প্রকাশিত, সে বিষয়ে কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন। ফলে এসব প্রবন্ধের স্থান-কাল নিরপেক্ষ গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে স্থানিক ও কালিক গুরুত্ব সম্পর্কেও আমরা অবহিত হতে পারি। লেখক জানিয়েছেন যে, প্রবন্ধগুলো ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে রচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে যে সময়টা সবচেয়ে উত্তপ্ত ও বিতর্কমুখর ছিল, সে সময়-পরিসরেই এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। ফলে স্থানীয় সমস্যাকেন্দ্রিক যেমন, তেমনি সমকালীন সমস্যাকেন্দ্রিক—উভয় ক্ষেত্রেই মনোযোগী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। সমকালের সামাজিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগগত পরিস্থিতির গভীর ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধে উচ্চারিত বক্তব্যই ব্যক্তি ও সমাজকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে— উন্নতির ও উৎকর্ষের পথে

পরিচালিত করার প্রচেষ্টা অনুভূত হয়।

বিষয়ের দিক থেকে বিচার করলে এই গ্রন্থের সবকটি প্রবন্ধই অতি উচ্চস্তরের অনুধ্যান ও তথ্য অবলম্বনে রচিত, তা বলাই বাহুল্য। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধকে দার্শনিক বিবেচনা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ হিসাবে গণ্য করা চলে। এ প্রসঙ্গে 'মানবতাবাদ ও মানুষের অধিকার', 'নৈতিক চেতনা : ধর্ম ও মতাদর্শ : প্রগতি ও অধোগতি', 'বিবেক যুক্তি ও প্রগতি', 'রাজনীতি ও দর্শন' এবং 'মাও সেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধের নাম করা যেতে পারে। 'প্রতিভা ও নেতৃত্ব : বাংলাদেশের পরিস্থিতি', 'বাঙালির রাজনৈতিক প্রতিভা', 'আশা–আকাঙ্ক্ষায় চড়াই-উতরাই', 'সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বিপর্যয় ও বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম' এবং 'আধুনিক যুগে বাঙালির চিন্তাধারা ঃ আমূল পরিবর্তনবাদী প্রবণতা' প্রভৃতি প্রবন্ধে বাংলাদেশকেন্দ্রিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ের নিবিড় চিন্তা–ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। সাহিত্য–সংলগ্ন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় 'বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা', 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা', 'বেগম রোকেয়া ও উত্তরকাল', 'বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্য', 'বইয়ের জগতে ভালোমন্দ' প্রভৃতি প্রবন্ধকে। ধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতিচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগুলো হচ্ছে— 'ইতিহাসচেতনা : অতীতের মোহ ও ভবিষ্যতের কল্পস্বর্গ', 'সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিকর্মীর সামাজিক অঙ্গীকার', 'অপসংস্কৃতি ও সংস্কৃতি : অবক্ষয় ও উজ্জীবন' এবং 'বাঙালি সমাজে ইসলাম' প্রভৃতি প্রবন্ধ। সকল প্রবন্ধের মর্মেই রয়েছে সূক্ষ্ম ও গভীর নৈতিক বিবেচনা।

মোটা দাগে প্রবন্ধগুলোকে এই কয়টি বর্গে বিভক্ত করা গেলেও প্রায় সব প্রবন্ধের মূল সুরই একটি অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত ; আর তা হচ্ছে মানুষের মানবিক, জাগতিক, সাংস্কৃতিক উন্নতির চিন্তা। আবুল কাসেম ফজলুল হক এ অর্থে মানবদরদী, মানববাদী, মানবতাবাদী চিন্তাবিদ। তিনি তাঁর সকল চিন্তার কেন্দ্রে স্থাপন করেন মানুষকে। এসব প্রবন্ধ লেখার মূলে যে তাগিদ ও চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল, সে সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন :

> কোনো প্ররোচনা–বশে নয়, অন্তরের তীব্র তাগিদেই প্রতিটি প্রবন্ধ রচিত। অন্তরের তাগিদকে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, বিবেকের ও জ্ঞানের আলোকে বিচার–বিবেচনার নিরিখে যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে ভাষারূপ দিতে চেয়েছি। আবেগের নির্দেশক হিসেবে বুদ্ধিকে সবসময় জাগ্রত ও সক্রিয় রাখতে চেয়েছি। প্রায় প্রতিটি লেখার মধ্যেই আমার যেটুকু শক্তি তা সম্পূর্ণরূপে দিয়ে

> দিতে চেয়েছি। নিতান্তই চিন্তার জন্য চিন্তা আমি করতে চাইনি ; এই বাংলাদেশে মানুষের জীবন, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ভেঙে গড়ার দুঃসাহসিক অভিযানের আশায় আমার এসব লেখা। পরিবেশ অত্যন্ত প্রতিকূল, এবং একান্ত নিঃসঙ্গ যাত্রী আমি। তবু ক্ষণকালের ভেলাকে ভাসাতে চেয়েছি চিরকালের স্রোতে।

লেখকের এই বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, মানুষের প্রতি কী গভীর ভালবাসা ও দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি সম্পর্কে তিনি চিন্তা করেছেন এবং চিন্তাকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন। বইটি পড়ার সময় উপলব্ধি করা যায় যে, চতুষ্পার্শ্বের কোলাহলে লেখক একবারও আত্মহারা হননি।

'আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে' গ্রন্থটি প্রথাবদ্ধ কোনো দর্শনের কিংবা ইতিহাসতত্ত্বের অথবা নীতিবিজ্ঞানের বই নয়, কোনো সমাজবিজ্ঞানের কিংবা সাহিত্যতত্ত্বের বইও নয়। কিন্তু এই বইয়ের মধ্যে এ-সকল বিষয়ের উপাদান এত গভীর ও নিবিড়ভাবে, এত অধিক পরিমাণে স্থান পেয়েছে যে, বইটিকে এক সঙ্গে এই সকল শাখার সমন্বিত জ্ঞানের এক অসাধারণ বই বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। সে কারণে পাঠক হিসাবে বইটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেই খুব সহজে এ বইয়ের গভীরে প্রবেশ করে মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হবে না। বোঝার জন্য পাঠকের জ্ঞানের বহু শাখায় অধিকার এবং জীবনকে শত তলে, শত দলে, বহুভঙ্গিম রূপে অনুভব করবার সামর্থ্য দরকার। আমি লক্ষ্য করেছি যে, পাঠককে নিবিষ্ট চিত্তে বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চিন্তা ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে এ বইয়ের প্রতিটি প্রবন্ধের প্রতিটি বাক্য। তাই, এ গ্রন্থের পাঠক সংখ্যায় খুব বেশি হবে, এমনটি আশা করা যায় না। পৃথিবীর কোনো দেশেই তা হয় না। তবে দেশ, কাল, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, মানুষ ও মানবহিতৈষণা প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা, তাঁরা অবশ্যই এ বই পড়ে আনন্দিত ও উপকৃত হবেন এবং আগ্রহী মন নিয়ে, ঔৎসুক্য নিয়ে এই ধারায় আরও বই পড়তে এগিয়ে আসবেন। শুধু ভাবুক নন, যাঁরা একই সঙ্গে ভাবুক ও কর্মী তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন এসব চিন্তার মর্ম।

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোকে বিষয় অনুসারে না হলেও প্রবণতা অনুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, এ কথা আগে উল্লেখ করেছি। সে শ্রেণীকরণের আওতায় দর্শন-বিষয়ক যে কয়টি প্রবন্ধের নাম করেছি, তার মধ্যে 'মানবতাবাদ ও মানুষের অধিকার' নাম প্রবন্ধটির কথা প্রথমেই আসে। এই প্রবন্ধে লেখক মানবতাবাদের

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য করণীয় কি, তা অত্যন্ত চিন্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই লেখক বলেছেন—“মানবতাবাদ মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সংক্রান্ত একটি সামাজিক-নৈতিক মতাদর্শ। এই মতাদর্শে একদিকে মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা অনুসন্ধান করা হয়, এবং অপরদিকে মানবজাতির ও মানুষের পরিবেশের মধ্যে আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা হয়।” লেখক বলতে চেয়েছেন যে, মানবতাবাদকে আদর্শ হিসাবে অঙ্গিকার করে মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা যেমন অপরিহার্য ও জরুরি তেমনি জটিলতাপূর্ণ ও দুরূহ। বাংলাদেশে আশির দশকের বছরগুলোতে রাজনৈতিক পরিবেশের যে চিত্র দৃশ্যমান ছিল, তাতে যে এখানে মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করার সম্ভাবনা ছিল না, তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন যে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নৈতিক চেতনার সম্পর্ক সুগভীর। তিনি বলেছেন, গরিব দেশগুলোতে নৈতিক চেতনা, ইতিহাস-চেতনা ও আদর্শবোধ নিতান্ত দুর্বল ও অনুশীলনহীন থাকার ফলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে সর্বমুখী অন্তরায় সৃষ্টি হয়। সে কারণে সমগ্র পৃথিবীর গরিব দেশগুলোতে গণতন্ত্রের বিকাশ খুবই নগণ্য। এসব দেশে গণতান্ত্রিক আদর্শের বিকাশের পথে প্রধান দুটি অন্তরায়কে তিনি চিহ্নিত করেছেন এভাবে : “এক. রাজনৈতিক অঙ্গনে আত্মশক্তি সম্পর্কে জানার অনীহা, আত্মগঠনের চেতনার ও আয়োজনের অভাব, আত্মসমালোচনা-বিমুখতা ও নিগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ; দুই. ঔপনিবেশিক ও নয়া-ঔপনিবেশিক শক্তির আধিক্য।” মানবতাবাদ সম্পর্কে তিনি এই প্রবন্ধে চুলচেরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। তিনি যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, ‘ধর্ম, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—এ তিনের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে মানবতাবাদের উপাদান।’ মানবতাবাদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন যে, বিশ শতকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে পৃথিবীর দেশে দেশে মানবতাবাদের প্রতি চিন্তাশীলদের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই পৃথিবী জুড়েই মানবতাবাদের নবতর বিকাশের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আমাদের দেশের বিগত শতাব্দীর ও বর্তমান শতাব্দীর মানবতাবাদী কবি, লেখক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যে বিধৃত মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার কথাও এসেছে। মানবতাবাদের বিকাশে আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রিক ভিত্তির গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, সুদৃঢ় বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা না হলে

'মানবতাবাদ গভীর পর্যায়ে বাস্তবায়িত ও নতুনভাবে বিকশিত হতে পারে না।' প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি মানুষের অধিকারের বিষয়টির ওপর তাঁর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'মানুষের অধিকার ' কথাটির মধ্যে যে ঋজুতা আছে, 'মানবাধিকার' কথাটির মধ্যে তা নেই। বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক দেশেই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আলাদা আলাদাভাবে দেখা দিয়েছে। 'কালে কালে এক দেশের ধারণা আর এক দেশের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।' আর তাই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বিভিন্ন দেশে রূপবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অব্যাহত আছে এবং থাকবে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'নৈতিক চেতনা : ধর্ম ও মতাদর্শ : প্রগতি ও অধোগতি' একটি সুপরিসর প্রবন্ধ। প্রায় তিরিশ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধে তিনি নৈতিক চেতনা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। আজকের বাস্তবতা সম্পর্কে চোখ-কান খোলা রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে এই প্রবন্ধের মর্মোদ্ধার করা সম্ভব বলে ধারণা করি। 'পড়ে গেলাম' ধরনে পড়লে তথ্য, তত্ত্ব ও চিন্তার গভীরতা-সমৃদ্ধ এই প্রবন্ধটির গূঢ় বক্তব্য অনুধাবন করা যাবে না। এক অর্থে খুব উঁচুমানের দার্শনিক উপলব্ধি-সমৃদ্ধ এই প্রবন্ধটিতে নৈতিক সমস্যা ও নীতিবিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রায় সকল বিষয়ের অবতারণা করতে লেখক সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যকে অত্যন্ত দৃঢ়ভিত্তি সহকারেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থাপন করেছেন বলে মনে করি। তাঁর চিন্তার মর্মে উপস্থিত রয়েছে বাংলাদেশের জীবন্ত সমস্যা সমূহ সমাধানের লক্ষ্য। এ প্রবন্ধ থেকে আমরা নৈতিক চেতনার সঙ্গে ধর্ম ও মতাদর্শের সম্পর্ক, ইতিহাসের দিক থেকে প্রগতি ও অধোগতির পরিস্থিতিগত পরিচয় উদঘাটন করতে সক্ষম হই। প্রবন্ধের শুরুতেই লেখক আমাদের সমাজে বিরাজমান নৈতিক পরিস্থিতির একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। দুর্নীতি আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকেই ধাপে ধাপে বিস্তার লাভ করেছে, এবং বর্তমানে তার ব্যাপকতা কি ভয়াবহ, সে বিষয়ে লেখক বিশেষ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পরবর্তী সাড়ে চার দশক ধরে এ দেশের প্রতিটি সরকারই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। তাই সহজেই বলা চলে যে, নৈতিক চেতনা আজ আমাদের সমাজে ভূলুণ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে বিগত দিনগুলোতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, গোটা নির্বাচন-প্রক্রিয়াটাই 'দুর্নীতিগ্রস্ত হতে হতে সম্পূর্ণ মিথ্যার

কবলে পড়েছে।' আশির দশক পর্যন্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য। প্রবন্ধটিতে লেখক যে সকল বিষয়ের অবতারণা করেছেন, সেগুলোর ধারাক্রম নিম্নরূপ : বাঙালির বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক বোধ, ইতিহাসে নৈতিক চেতনার বিকাশের ধারা, বর্তমান নৈতিক পরিস্থিতি, অনৈতিক কর্মকাণ্ড, দেশের শাসনক্ষমতা গ্রহণে অনৈতিক উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ, আইন ও নৈতিক চেতনা, বিচার-ব্যবস্থা ও নৈতিক চেতনা, উন্নয়নচিন্তাবিদদের কাছে নৈতিক প্রশ্ন, উনিশ শতকের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নীতিবিদদের পরিচয়, মার্কসবাদ ও নৈতিক চেতনা, মানুষের চেতনার শ্রেষ্ঠত্ব, নৈতিক অনুশীলনের উপাদান, নৈতিক চেতনার বিকাশ ও বিকার, বিবেক ও নৈতিক চেতনা, মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নৈতিক চেতনা, বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা ভাষার প্রধান লেখকদের অভিমত, নৈতিক চেতনা যুক্তিবোধ ও বিবেক, আত্মত্যাগের ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে নৈতিক বিবেচনা, উন্নয়নশীল দেশে নৈতিক পরিস্থিতি, নৈতিক চেতনার বিকাশে ইচ্ছাশক্তি ও চিন্তাশক্তির ভূমিকা, সমাজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তৎপরতা, দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপনকারীদের সমস্যা, ধর্ম ও নৈতিক চেতনা, ধর্মের ও মতাদর্শের উদ্ভব প্রক্রিয়া, ধর্ম ও মতাদর্শের পার্থক্য ও মিল, ধর্ম ও আদর্শের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি, নৈতিক চেতনার সঙ্গে আর্থিক অবস্থার সম্পর্ক, এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে উন্নত নৈতিক চেতনা অর্জনে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ। একটি সুবৃহৎ বিষয়কে বুঝবার জন্য এভাবে বিশ্লেষণ করার কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু আমরা এই বিশ্লেষণ সূত্রে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, নৈতিক সমস্যার মতো একটি জটিল বিষয়কেও লেখক কিভাবে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করে এর চূড়ান্ত স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

'বিবেক যুক্তি ও প্রগতি' শীর্ষক প্রবন্ধটিও জটিল এবং গুরুত্বপুর্ণ। এটি দ্বিতীয় প্রবন্ধের ৪/৫ বৎসর আগে রচিত। ফলে এ প্রবন্ধের অনেক বক্তব্য পরে রচিত প্রবন্ধটিতে অধিক যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মফল, মানুষের অগ্রগতির উপায়, পথ ও বিপথ, মানবীয় গুণাবলীর সঙ্গে প্রগতির সম্পর্ক অন্বেষণ, মানুষের স্বরূপ এবং মানবীয় গুণ ও মানবীয় দোষ, যুক্তিপরায়ণতার অভাবের পরিণাম, আবেগ বিবেক ও যুক্তির বিকাশ, রাজনীতিক্ষেত্রে কিংবা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে বিবেকবোধ ও যুক্তিপরায়ণতা, ভালো নেতৃত্ব সৃষ্টিতে ব্যর্থতার কারণ, নৈতিক শক্তির উদ্বোধন ও বিকাশের উপায়, যুক্তিশীল হওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্রক্রিয়া, যুক্তি প্রয়োগের সুফল ও কুফল, যুক্তি প্রয়োগের

উদ্দেশ্য, স্বাধীন প্রগতিশীল জীবন প্রতিষ্ঠায় বিবেক ও যুক্তির ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ প্রবন্ধের উপসংহারে বাংলাদেশ সম্পর্কে লেখক অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই উচ্চারণ করেছেন যে, "বিবেক ও যুক্তির অনুশীলনের ভিত্তিতে যদি কোনো সংগ্রামী সংঘশক্তি সমাজের নিম্নস্তর থেকে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে সেই শক্তির পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে গৌরবময় জাগরণের নতুন যুগ সৃষ্টি করা এবং সমৃদ্ধ জীবনের প্রয়োজনে উন্নততর নতুন আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।"

'রাজনীতি ও দর্শন' প্রবন্ধটি এ গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করে আছে। এর বিষয়বস্তুও ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি বিষয়ে সারা পৃথিবীতে তাত্ত্বিক আলোচনার সীমা-পরিসীমা নেই, দর্শন বিষয়েও আলোচনার পরিস্থিতি সর্বত্র একই রকম। এই দুটি সুবিস্তৃত, সুপরিব্যাপ্ত, সুপ্রাচীন বিষয়কে তিনি বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিতে স্থাপন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, প্রবন্ধটি বাংলাদেশ দর্শন সমিতির জাতীয় সেমিনারে পাঠ করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ সালে রচিত। দেশে তখন চলছে সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে 'লাগাতার আন্দোলন'। রাজনীতির গতি-প্রকৃতি, রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা, সরকারের কর্মকাণ্ড, সরকার পরিচালিত নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে দেশের জনগণের অনাস্থা, অবিশ্বাস, অসন্তোষ তখন চরমে পৌঁছে গেছে। সেই প্রেক্ষাপট মনে রাখলে প্রবন্ধটির অনেক বক্তব্যের যাথার্থ্য এবং লেখকের দূরদর্শিতা অনুধাবন করা সম্ভব হয়। রাজনীতির সঙ্গে দর্শনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান- এ কথা অনস্বীকার্য। তাই আমাদের কালে কোনো তাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনা করতে হলেও সমকালীন রাজনীতিকে, তার গতি প্রকৃতিকে, তার অবস্থা-অবস্থানকে অবলম্বন করতেই হয়। ফলে এই প্রবন্ধটি যতটুকু তাত্ত্বিকতায় সমৃদ্ধ হতে পারত, তার-চেয়ে বেশি বাস্তব পরিস্থিতি ও চলমান রাজনীতি নির্ভর হয়েছে। এই প্রবন্ধটিকে লেখক পাঁচটি উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে প্রস্তাবনা, প্রজ্ঞাপ্রেম না জীবন-জগতের প্রতি ভালবাসা?; প্রকৃত দার্শনিকিরাই মানবজাতির মহত্তম শিক্ষক ; বাঙালির দর্শন ; বাংলাদেশের রাজনীতি। এই পাঁচটি উপবিভাগের মধ্যে অনেক বিষয়ে আলোচনা এসেছে, অনেক বিষয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এসেছে। এ প্রবন্ধেরও কিছু বক্তব্যের উপস্থিতি অন্য কোনো কোনো প্রবন্ধে লক্ষ্য করি। একই বক্তব্যের বার বার উপস্থিতি বিভিন্ন প্রবন্ধে লক্ষ্য করলেও এগুলোকে পুনরুক্তি বলা ঠিক হবে না। একই

বক্তব্যকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করে তিনি বিভিন্ন প্রতিপাদ্যকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করতে সচেষ্ট হয়েছেন বলে মনে করা চলে।

'মাও সেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব' প্রবন্ধটি গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধ হলেও এটিকে আমরা দার্শনিক মতামত সমৃদ্ধ প্রবন্ধের বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করেছি। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ বলে মনে হলেও এ প্রবন্ধে রয়েছে জ্ঞান ও কর্ম বিষয়ক গভীর দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ। চীন-বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে মাও সেতুঙ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় তাড়িত হয়ে জ্ঞান ও কর্মের সম্পর্ক নির্ণয়ের এবং বিপ্লবের তত্ত্ব রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। 'মাও সেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব' প্রবন্ধে লেখক আশ্চর্য দক্ষতায় মাও সেতুঙের চিন্তার সারসংকলন করেছেন। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ রেখেছেন বাংলাদেশের প্রয়োজনের দিকে। তিনি অনুভব করেছেন যে, বাংলাদেশে জনস্বার্থে সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে তার জন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও তত্ত্বনির্ণয় দরকার। এই প্রয়োজনবোধ দেশের ভাবুক ও কর্মীদের মনে জাগাবার জন্যই তিনি এ-প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যৌক্তিক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে রচিত এ-প্রবন্ধের বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে বলতে পারি যে, জ্ঞান ও কর্মের সম্পর্ক ও পদ্ধতি বিষয়ে এ ধরনের লেখা বাংলা ভাষায় আগে ছিল না। মাও সেতুঙের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের নিজের চিন্তা।

'প্রতিভা ও নেতৃত্ব : বাংলাদেশের পরিস্থিতি' ১৯৮৬ সালে রচিত। প্রতিভা মানুষের মৌলিক গুণ বলে স্বীকৃত। তবে অনুশীলনের মাধ্যমেই প্রতিভার প্রকাশ ও বিকাশ। নেতৃত্বও মানুষের মধ্য থেকেই বিকশিত হয়। এর ভিত্তিকেও মৌলিক মানবীয় গুণের মধ্যে খুঁজতে হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মৌলিক গুণ হিসাবে চিহ্নিত করলেও 'নেতৃত্ব'কে 'প্রতিভা' নামক গুণের তুলনায় একটু আলাদাভাবে দেখা দরকার। কারণ, মানুষ নিজস্ব চেষ্টা কিংবা ক্ষমতা দিয়ে নেতৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কখনও কখনও অবস্থার সুযোগেও অনেকে নেতৃত্বের পদে সমাসীন হয়ে যেতে পারেন। মানুষের প্রতিভা ও নেতৃত্ব নামক এই দুইটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোর কি অবস্থা তা নিয়ে মাত্র দশ পৃষ্ঠায় আলোচনা শেষ করেছেন। প্রবন্ধটি এ বিষয়ে চিন্তা উদ্রেককারী।

'বাঙালির রাজনৈতিক প্রতিভা' ছোট পরিসরে রচিত প্রবন্ধ। এর বিষয় রাজনীতি-নির্ভর হলেও এখানে লেখকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের এই শতাব্দীর প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের নামোল্লেখ

করে খুব সংক্ষেপে তাঁদের নেতৃত্বের মূল বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, আমাদের প্রধান রাজনীতিবিদদের মধ্যে দুটি স্পষ্ট ধারা বিদ্যমান ছিল সব সময়ই। এ প্রবন্ধের শেষ বাক্যটি উদ্ধৃতিযোগ্য—'উন্নত বৈষয়িক জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য চাই উন্নত মানসিক জীবন, আর উন্নত মানসিক জীবন ব্যতিরেকে উন্নত বৈষয়িক জীবন অর্থহীন।'

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে 'আশা-আকাঙ্ক্ষায় চড়াই-উতরাই' অন্যতম। এখানে আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে গিয়ে লেখক বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই বলেছেন। মনে রাখা দরকার, এই প্রবন্ধটির রচনাকালও ১৯৮৬ সাল। এখানে বাংলাদেশের বিগত দিনের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকে ভিত্তি হিসাবে গণ্য করেছেন। এই একটি প্রবন্ধে লেখক তাঁর বিগত দিনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধান, অনুধ্যান ও চিন্তাভাবনার কিছু পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'লোকায়ত' পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু সম্পাদকীয় বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি স্পষ্টতর করার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালের দিকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশ ঘটেছিল। লেখক তখন সেসব পত্রিকার সম্ভাবনার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং একটা সম্ভাব্য ইতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বলে আশা পোষণ করেছিলেন। প্রবন্ধটিতে লেখকের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকায় চারিত্রগত দিক থেকে এটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। বাঙালির অতীতের চৈতন্যগত উৎকর্ষের কথা স্মরণ করে উন্নততর ভবিষ্যতের কামনা তিনি করেছেন এই প্রবন্ধের উপসংহারে। তিনি অত্যন্ত আশাবাদী কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন— "আমরা চাই : আমাদের মনোজগতে জাগরণের নবযুগ দেখা দিক, মুক্তির নবচেতনা উদ্দীপ্ত হোক, নতুন রেনেসাঁসের প্লাবনে সকল কলুষ-কালিমা ধুয়ে মুছে যাক, জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চারের আদর্শগত ভিত্তি তৈরি হোক, আর্থিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ উন্নতির সোপানে পৌঁছুক, দর্শন বিজ্ঞান কাব্য সঙ্গীত এই বাংলাদেশে নতুন প্রাণ লাভ করুক, পৃথিবীকে জানবার মতো বাণীর সাধনা এই বাংলাদেশে আবার সূচিত হোক।"

'সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বিপর্যয় ও বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রচিত।

আশির দশকের প্রথমার্ধে তৎকালীন সোভিয়েত নেতা গর্বাচেভের পেরেস্ত্রৈইকা ও গ্লাসনস্ত নামক নতুন কর্মনীতি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা একটা বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল। সে ধাক্কায় অনেক নিবেদিতপ্রাণ সমাজতন্ত্রীর মনেও নতুন দোলা লেগেছিল। গর্বাচেভের নীতি-আদর্শের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে অনেকে যথার্থ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন। এটা শুধু আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রী কিংবা মার্কর্সবাদী চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহকদের মধ্যেই নয়, যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, সেখানেও মুক্ত উদার হাওয়ার দিকে মানুষের মন ধাবিত হয়েছিল টর্নেডোর বেগে। অবশেষে একদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সারা বিশ্বে বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে বিপর্যয় ঠেকানো কোনোমতেই সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিসাবে আবুল কাসেম ফজলুল হক অকপটভাবে তাঁর অনুভূতি ও চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনায়, সমাজতান্ত্রিক ভাব-ভাবনায় কিংবা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিরাজমান পরিস্থিতিতে কোথায় কখন কিভাবে ফাঁকিগুলো দেখা দিতে শুরু করেছিল, এর পিছনে নয়া-উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহ কি ভূমিকা পালন করেছে, সেসব বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা আছে এই প্রবন্ধে। আর একই সঙ্গে বিরাজমান বিশ্বপরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের পর্যায়টি অবলোকন করার প্রয়াসও আছে এতে। ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির লক্ষে বারো দফা প্রস্তাবও এই প্রবন্ধের শেষাংশে যুক্ত করেছেন। প্রস্তাবটি শুধু ১৯৯০ সালের সময়সীমার মধ্যেই বিচার্য, তাই নয়, প্রস্তাবের কার্যকারিতা আজও সমানভাবে বিদ্যমান। দীর্ঘকাল এই প্রবন্ধে বিধৃত চিন্তার উপযোগিতা থাকবে বলে আমাদের ধারণা। কারণ যে পর্যায়কে জনগণের মুক্তি বলে চিহ্নিত করা যাবে, সে পর্যায়ে পৌঁছতে এ দেশের জনগণকে দীর্ঘ সময় সংগ্রাম করতে হবে।

'আধুনিক যুগে বাঙালির চিন্তাধারা : আমূল পরিবর্তনবাদী প্রবণতা' মোটামুটি বড় পরিসরের প্রবন্ধ। এতে ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থাকেই পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে পটভূমিতে স্থাপন করা হয়েছে শ্রীচৈতন্যের কাল থেকে পরবর্তী চার পাঁচশত বৎসরের চিন্তাভাবনার পরিচয়। এ প্রবন্ধে শীলভদ্র, দীপঙ্কর, শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে রামমোহন, ডিরোজিও-ডেভিড হেয়ার-রিচার্ডসন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ প্রায় সকলেরই চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে। লেখক এরই মধ্যে আমূল পরিবর্তনবাদী ধারার পরিচয় চিহ্নিত করেছেন। তিনি তাঁদের চিন্তার ধারাক্রম কয়েকটি স্তরে অগ্রসর হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধারার চিন্তার মধ্যে বিভেদ ছিল, বিভিন্নতা ছিল, মতবিরোধ ছিল, কিন্তু এসব সত্ত্বেও পুরাতন চিন্তাধারার বেড়াজাল ভেঙে বাঙালির চিন্তাভাবনা নতুন স্তরে প্রবেশ করেছিল তাঁদের মাধ্যমেই—এ কথা লেখক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধে লেখকের চিন্তার স্বকীয়তার পরিচয় পরিস্ফুট।

'বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা', 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা', 'বেগম রোকেয়া ও উত্তরকাল', 'বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্য', 'সাহিত্যবিচারে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন', 'বইয়ের জগতে ভালো-মন্দ' প্রভৃতিকে আমি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত সাহিত্য-সংলগ্ন প্রবন্ধ হিসাবে সূচনাতেই চিহ্নিত করেছি। 'বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা' প্রবন্ধটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে (জাতীয় পর্যায়ে) রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষে শিলাইদহে অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শেষদিনে অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১১ই মে তারিখের অধিবেশনে পঠিত হয়। এ প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে যেসব তর্ক-বিতর্ক, চিন্তা-ভাবনা, বিরোধ-বিতণ্ডা এবং একাডেমিক চর্চা হয়েছে তার সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। এদেশে প্রকাশিত রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদিরও বিচার-বিশ্লেষণ করে গুরুত্ব নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন তিনি। বাংলাদেশের বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ কি অবস্থানে বিরাজ করছেন তা অতি সহজে অনুধাবন করা যাবে 'বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা' প্রবন্ধটি পাঠ করলে। লেখক অতন্ত উদার মন নিয়ে রবীন্দ্র-স্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহে 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এই প্রবন্ধে। আজ হোক, কাল হোক, এ ধরনের প্রস্তাবের প্রতি আমাদের দেশের চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিসেবক, রাজনীতিবিদ, কবি-লেখক-সাহিত্যিকের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্পর্কেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আছে যা সকলের মনোযোগ দাবি করে।

'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা' আকারে ছোট। বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও চিন্তাবিদ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি', 'সাহিত্যসম্রাট' ইত্যাদি বলে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলা সাহিত্যের পরিচর্যায় রত ছিলেন,

তা সৃজনশীল লেখার মাধ্যমেই হোক কিংবা 'বঙ্গদর্শন' নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার মাধ্যমেই হোক, তখন সাহিত্যাদর্শসহ সাহিত্যের ভালো-মন্দ, উদ্দেশ্য-অন্বিষ্ট সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার প্রধান প্রেরণা ছিল মানবপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশহিতৈষণা। দেশ-প্রেমমন্ত্রে নিজে যেমন উদ্বুদ্ধ ছিলেন, তেমনি অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি নিছক আনন্দের সামগ্রী মনে করেন নি কখনই। তাই তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।' বঙ্কিমের সাহিত্যবিষয়ক এমনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে তাঁর সাহিত্যচিন্তার সারাৎসার তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। আবুল কাসেম ফজলুল হক মনে করেন, বঙ্কিমের চিন্তাভাবনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আজকের দিনেও আমাদের এগিয়ে চলার পথ তৈরি করা সম্ভব। অতীতের আলোচনায়ও তাঁর দৃষ্টি পশ্চাৎমুখী নয়, সম্মুখবর্তী। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই বঙ্কিমের চিন্তাচেতনার সঙ্গে বিশেষ করে সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে নতুনভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

'বেগম রোকেয়া ও উত্তরকাল' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়াকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিগত এক শতাব্দীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। বেগম রোকেয়া নিজেকে নিজে তৈরি করে নিয়েছিলেন। আমাদের দেশের অবহেলিত নারী জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল প্রচেষ্টা ও প্রতিভা নিয়োজিত করেছিলেন, নারী শিক্ষার বিস্তারে অগ্রণী হিসাবে সমাজে বরেণ্য হয়েছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্যের মাধ্যমে নারী জাগরণের বাণী বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। বেগম রোকেয়া সম্পর্কে আবুল কাসেম ফজলুল হকের মূল্যায়ন বেশ সুদৃঢ়। তিনি বলেছেন —"অন্ধ বিশ্বাসে আবিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জিজ্ঞাসাহীন এক অধঃপতিত সমাজে জন্মগ্রহণ করে তিনি সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে পরিবেশের পীড়ন অনুভব করেছিলেন, এবং মুক্তির পথ সন্ধান করেছিলেন। অপরাজেয় মনোবলের অধিকারী এই মহিলা প্রচলিত ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ না করে উন্নততর নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় নিজের ক্ষেত্রে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রামরত ছিলেন।"

লেখক এই প্রবন্ধে স্বল্প পরিসরে বেগম রোকেয়ার প্রতিভার পরিপূর্ণ পরিচয় উদঘাটন করে পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাধারা কিভাবে আমাদের সমাজে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন গবেষক ও লেখকের বেগম রোকেয়া সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা অবগত হতে পারি।

'বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি আমাদের দেশের সামগ্রিক অনুবাদকর্মের একটি উৎকৃষ্ট পরিচয় সংবলিত প্রবন্ধ। এখানে তিনি অনুবাদের বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য প্রভৃতি সকল দিককেই আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে প্রবন্ধটির রচনাকাল অর্থাৎ ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে আমাদের দেশের অনুবাদ সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট চিত্র আমরা এই প্রবন্ধ থেকে সহজেই পেতে পারি।

'সাহিত্যবিচারে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রচিত। এতে ১৯৮১ সালে রচিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা' শীর্ষক প্রবন্ধের কিছু বক্তব্যের পুনরুল্লেখ আছে। বিষয়ের সাযুজ্যের কারণেই সম্ভবত এ রকমটি তিনি করেছেন। তবু এই প্রবন্ধে সাহিত্যবিচারে অর্থাৎ সমালোচনা কর্মে বাংলা ভাষায় চিন্তাধারার বিবর্তনের একটি স্পষ্ট পরিচয় আছে।

'বইয়ের জগতে ভালোমন্দ' প্রবন্ধে লেখক আমাদের দেশের সাহিত্য-পরিস্থিতি তথা বইয়ের জগত, লেখকের জগত, লেখকের আদর্শ-উদ্দেশ্য, পাঠকের চাহিদা, পাঠকের চিন্তা-চেতনা, পাঠকের স্বার্থ, বইয়ের উৎকর্ষ-অপকর্ষ যাচাই প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গত কারণেই এই প্রবন্ধে লেখক কালজয়ী ও সাময়িক—এই দুই ধারার বই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ মনোগ্রাহী মন্তব্য উপস্থিত করেছেন।

ইতিহাসচিন্তা, সংস্কৃতিচিন্তা ও ধর্মচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধের শ্রেণীতে যে কয়টি প্রবন্ধ এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বলে আগে উল্লেখ করেছি, সেগুলোকে শুধুমাত্র একটি সীমিত পরিচয়ে পরিচিত করালে সত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে না। কারণ এইসব প্রবন্ধেও লেখকের দার্শনিকসুলভ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিচয় আছে। সুগভীর দার্শনিক উপলব্ধিতে এ প্রবন্ধগুলোও সমৃদ্ধ। 'ইতিহাস চেতনা : অতীতের মোহ ও ভবিষ্যতের কল্পস্বর্গ' প্রবন্ধে ইতিহাসের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখকের

সুগভীর ইতিহাসচেতনার ও ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার ও জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে। আমাদের দেশের ভাবুক ও কর্মীদের মধ্যে ইতিহাসচেতনাকে ক্রিয়াশীল করার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ রচিত বললে অন্যায় হবে না।

'অপসংস্কৃতি ও সংস্কৃতি : অবক্ষয় ও উজ্জীবন' এবং 'সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিকর্মীর সামাজিক অঙ্গীকার' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটির কেন্দ্রীয় বক্তব্যে বিষয়বস্তুর ঐক্য আছে। এ দুটি প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে গত এক শতাব্দী যাবৎ বাংলা ভাষায় বিকশিত সংস্কৃতি চিন্তার মর্মার্থ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গোপাল হালদার, মোতাহের হোসেন চৌধুরী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যাঁরাই সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করেছেন তাঁদের সকলের চিন্তার সারমর্মকে কালক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি চিন্তার ইতিহাস রচনা করেছেন এবং সকলের চিন্তার সংশ্লেষণের ভিত্তিতে সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশে সংস্কৃতিচিন্তা ও সংস্কৃতিচেতনাকে সুস্থ-সবল-সুন্দর খাতে প্রবাহিত করার তাগিদ এ-প্রবন্ধ রচনার চালিকাশক্তি।

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে 'বাঙালি সমাজে ইসলাম' প্রবন্ধটি। ইসলাম এবং বাংলাদেশের মুসলিম-সমাজ সম্পর্কে লেখকের গভীর জ্ঞানের ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে এ প্রবন্ধে। বাংলাদেশে মুসলমান সমাজের বিকাশকে ইতিহাসের আশ্রয়ে এ-ভাবে বিশ্লেষণ করার দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। আমাদের দেশে সমাজের ও জাতির ঐতিহাসিক প্রবণতাকে বুঝবার ক্ষেত্রে এ-প্রবন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। এখানে লেখকের বিচার নিরাসক্ত, বুদ্ধিনির্ভর, আবেদনশীল।

এ গ্রন্থে সংকলিত প্রতিটি প্রবন্ধের মতামত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে লেখক কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে একই বক্তব্যের কিংবা একই ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের পুনরুক্তি পরিদৃষ্ট হয়, একথা আগেও উল্লেখ করেছি। তবে এ ধরনের পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তি পাঠক-মনকে পীড়া দেয়নি বরং উচ্চারিত বক্তব্যকে যুক্তিগ্রাহ্য, শক্তিশালী ও অনুধাবনযোগ্য করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহের মাধ্যমে আবুল কাসেম ফজলুল হক আমাদের চেতনার জগতকে আলোড়িত করেছেন, সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে ব্রতী হওয়ার জন্য

আগ্রহী করে তুলেছেন, দেশ ও জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হতে প্রণোদনা জুগিয়েছেন। উন্নত মানসিকতার স্পর্শে প্রতিটি প্রবন্ধই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, দেদীপ্যমান হয়েছে প্রতিটি বক্তব্য, জ্যোতিষ্মান করতে সক্ষম হয়েছে আমাদের মনশ্চক্ষুকে। তাই এ গ্রন্থের বক্তব্য আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের বিশিষ্ট সোপান হিসাবে বিবেচিত হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবুল কাসেম ফজলুল হকের চিন্তার জগৎ পরিচ্ছন্ন, ভাবালুতা-মুক্ত, দূরবিস্তারী। বলা বাহুল্য, কোনো সংকীর্ণ কিংবা গণবিরোধী মতাদর্শ তাঁর চিন্তাজগতে কখনো স্থান পায়নি। দেশ, জাতি, সমাজ, সমাজবদ্ধ মানুষের দুর্গতিগ্রস্ত বর্তমানকে সমৃদ্ধ করার মানসে তিনি যেমন তাঁর চিন্তাভাবনার জগতকে আমাদের চেতনাগত করার ব্যাপারে সর্বদা উন্মুখ, তেমনি এ সমাজের, এ জাতির, এ দেশের সংহত ভবিষ্যৎ এবং উচ্চ ধারণা-সমৃদ্ধ মনোজগত তৈরির লক্ষ্যেও তাঁর প্রয়াস নিরন্তর তৎপর।

'আশা-আকাঙ্ক্ষায় সমর্থনে' গ্রন্থের মাধ্যমে আবুল কাসেম ফজলুল হকের যে শ্রেয়োচেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তাতে তাঁকে আজকের বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নির্ভীক চিন্তাবিদ হিসাবে চিহ্নিত করতে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই আগ্রহী হয়ে উঠি। এ গ্রন্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি বিচ্যুতিকে আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করে মহৎ চিন্তাচেতনা ও শাশ্বত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বক্তব্যসমূহকে উন্নত সমাজ ও সমৃদ্ধ জাতি প্রতিষ্ঠার পাথেয় হিসাবে অবলম্বন করতে পারি।

মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ*

---

* উপ-পরিচালক, পত্রিকা উপ-বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা